একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

The revival of Gaudiya Vaishnavism in Bengal in the 19th century

উনিশ শতকে বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পুনর্নির্মাণ

Name of the Author: **Shiladitya Saha**

Affiliation: **Research Scholar, Bengali Department, Jadavpur University, West Bengal, India**

Abstract: The Vaishnava movement initiated by Sri Chaitanya created a strong devotional culture in Bengal's social and cultural life. After his time, the movement split into two streams: the scholarly, Sanskrit-based theological Vaishnavism centered in Vrindavan led by the Six Goswamis, and the popular kirtan-based Vaishnavism in Bengal promoted by Nityananda, Advaita and other associates of Chaitanya. In the sixteenth century, preachers like Srinivas Acharya, Shyamananda Das and Narottam Das Thakur helped connect these two traditions. However, from the late seventeenth century the movement declined due to weak leadership and the rise of Sahajiya sects. By the nineteenth century, Vaishnavism faced criticism from colonial writers, missionaries and educated elites, who accused it of moral degeneration. In response, reformers such as Kedarnath Datta (Bhaktivinoda Thakur) and Shishir Kumar Ghosh attempted to revive Gaudiya Vaishnavism through publications, organizations and reinterpretation of Chaitanya as a historical and cultural figure, thereby restoring its respectability and influence in Bengali society.

Keywords : Sri Chaitanya, Gaudiya Vaishnavism, Bhakti Movement, Sankirtan Tradition, Sahajiya Sects, Colonial Criticism, Vaishnava Reform, Kedarnath Datta (Bhaktivinoda Thakur), Shishir Kumar Ghosh, Bengali Religious Revival

উনিশ শতকে বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পুনর্নির্মাণ

শিলাদিত্য সাহা

ভারতের ভক্তি আন্দোলনগুলির মধ্যে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলন বাংলার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্তরে একটি ভক্তিবাদী পরিভাষা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী সময়ে এই ভক্তি আন্দোলনের ধারা দুটি পৃথকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ষড় গোস্বামী বা চৈতন্য পার্ষদদের অনুসৃত বৃন্দাবনকেন্দ্রিক সংস্কৃত ভাষা অধ্যুষিত তাত্ত্বিক বৈষ্ণবতা। অন্যদিকে নিত্যানন্দ অদ্বৈত এবং বঙ্গদেশে চৈতন্য পার্ষদদের দ্বারা সংগঠিত সংকীর্তন নির্ভর..... সহজ আঞ্চলিক ভাষা ও রীতির দ্বারা প্রভাবিত বৈষ্ণবতা। এই দুই ধারার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলেন ষোড়শ শতাব্দীর যিনি প্রধান বৈষ্ণব প্রচারক - জাজিগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য, গোপিবল্লভপুরের শ্যামানন্দ দাস এবং খেতুরির নরোত্তম দাস ঠাকুর। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এবং বিভিন্ন সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কুপ্রভাবের ফলে বাংলায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবক্ষয় শুরু হয় যার ফলে বৈষ্ণব সহজিয়া উপসম্প্রদায়গুলি প্রধান হয়ে ওঠে।

এবার দেখা যাক, উনিশ শতকে বৈষ্ণব ধর্মের অবস্থা কেমন ছিল? এক প্রতিবেদক উনিশ শতকে বৈষ্ণব ধর্মের অবস্থা সম্পর্কে বলেন যে,

"Vaishnavism was almost abandoned by the educated section of the people. Its literature was hardly read. Kirtana (ritual congregational singing) was looked down upon not as a form of prayer, but as means of gratification by people of loose morals. Most of the Vaishnava followers of the period lost their high standard of morality; they ceased to love asceticism, intellectual superiority and devotional favour which were the main characteristics of the previous Vaishnava masters." [১]

কিন্তু আমরা দেখতে পাই উনিশ শতকের শুরুতে বাংলার মোট জনসংখ্যার পাঁচভাগের প্রায় এক ভাগই ছিল বৈষ্ণব। উইলিয়াম ওয়ার্ড ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে লেখেন,

"Two persons in ten, of the whole Hindoo, population of Bengal are supposed to be followers of chaitanya." [২]

আবার, ওয়াল্টার হ্যামিলটন তাঁর Description of Hindustand (Vol.1) বইতে বলেন বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম ছিল বৈষ্ণব ধর্ম। উইলিয়াম ওয়ার্ড বৈষ্ণব সমাজের তিনটি স্তর লক্ষ করেছেন। প্রথমটি, গোস্বামী ও তাদের গৃহস্থ শিষ্যগণ, দ্বিতীয় আখড়া কেন্দ্রিক বৈরাগী বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং তৃতীয়টি, সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধারা গুলি; এই বিবিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও নৈতিক অবক্ষয়ের কথা প্রচার

করেন ঔপনিবেশিক যুগে খ্রীস্টান মিশনারী, প্রাচ্যবাদী গবেষক এবং আদমসুমারির সম্পাদকেরা। এই ক্ষেত্রে রেভারেন্ড উইলিয়াস ওয়ার্ডের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি বলেন,

"Vaisnavism is the religion of the people of very lowest description that encourages and indiscriminate and most licentious mixture of sexes."[৩]

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে, Hunt এর Statistical account of Bengal থেকে শুরু করে ১৮৭২, ১৮৮০, ১৮৯০ এবং তার পরবর্তী সেন্সাস গুলিতেও বৈষ্ণব গোস্বামীদের পতিতা সম্প্রদায়ে শুরু এবং আখড়ার মোহান্ত বৈরাগীদের অনৈতিক জীবনধারার কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে এই ধরনের কুৎসা যে শুধুমাত্র উপনিবেশিক শাসক কিংবা খ্রিস্টান পাদরিরাই রটিয়েছিল এমনটা নয়। বাঙালি উচ্চবিত্তরাও এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে প্রায় কুড়িটির বেশি বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়ের কথা বলেন। যেমন, সাহেব ধনী, আউল, বাউল, দরবেশ, কর্তাভজা, কৃতি, শুধুমাত্র অক্ষয়কুমারই নয়, অন্যতম ব্রাহ্মনেতা উমেশচন্দ্র বটব্যাল তত্ত্ববোধিনী, ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় চৈতন্য ও চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের কঠোর সমালোচনা করেন। এছাড়া হিন্দু উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণেরাও বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির বিরোধিতা করতেন। নবদ্বীপ বৈষ্ণব সমাজের প্রধান যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'Hindu casts and sect' ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই বইতে নিম্ন বর্ণের সংস্পর্শে থাকা বৈষ্ণব সম্প্রদায় গুলির তীব্র নিন্দা করেন। তিনি চৈতন্যকে কোনো ধর্মসংস্কারক হিসাবে গ্রহণ করেননি, তাঁর মতে-

"The utmost that can be said in favour of chaitanya, spiritual he looked upon the illicit amours of krishna in a spiritual sense, and that he never meant that they should be imitated by his followers for the gratification of their sensuality … to suppose that he never could anticipate the result's which are now found to arise out of the cult that he inculcated, is the height of absurdity" [৪]

তিনি বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন- ক) কুখ্যাত চৈতন্য সম্প্রদায়, খ) কুখ্যাত গুরুবাদী উপসম্প্রদায়, গ) গৌণ গুরুবাদী উপসম্প্রদায়। তিনি আরো বলেন যে একমাত্র সামাজিক বহিষ্কারের মাধ্যমেই হিন্দু সমাজকে এদের সংক্রমণ থেকে বাঁচানো সম্ভব। এই ধরনের সমালোচনার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই – উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ধারাটি গড়ে উঠেছিল বলা যেতে পারে।

উপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের দ্বারা এই সময় বৈষ্ণব ধর্মের রীতি, নীতি, ব্যবস্থা, ব্যবহারিক আচরণবিধির পুনর্নির্মাণ হতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে মুদ্রণযন্ত্রের প্রবেশের ফলে শিক্ষিত বৈষ্ণবরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে পুনঃনির্মাণ করার সুযোগ পেল, এর ফলে উনিশ শতকে বিভিন বৈষ্ণবসভা, সমিতি ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়। যেমন ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে বেহালায় হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ

কুলুটোলায় স্থাপিত হয় শ্রীচৈতন্যসভা প্রভৃতি। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে প্রায় উনত্রিশটি হরিসভা স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এছাড়া প্রকাশ হতে থাকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বৈষ্ণব পত্রপত্রিকা। শ্রী হরিদাস দাস বাবাজী তার 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য' গ্রন্থে উনিশ শতকে প্রকাশিত ১৮টি পত্রিকার কথা উল্লেখ করেন, পত্রিকা গুলি হল-

শ্রী চৈতন্য কীর্তি-কৌমুদী (১২৬৮ বঃ), শ্রীনিত্যানন্দ দায়িনী (১২৭৭ বঃ) স্ত্রী সজ্জন তোষনী (১২৮৮ বঃ), বৈষ্ণব (১২৯৩ বঃ), শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া (১২৯৮ বঃ), শ্রী চৈতন্যমতবোধিনী (১২৯৯বঃ), শ্রী চৈতন্য (১৩০২বঃ), বিষ্ণুপ্রিয়া আনন্দবাজার (১৩০৬ বঃ), গৌড় বিষ্ণুপ্রিয়া (১৩০৬ বঃ), গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব (১৩০৬ বঃ) প্রভৃতি।

এই সংস্কারবাদী প্রক্রিয়ায় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা ছিলেন তারা হলেন, রাধিকানাথ গোস্বামী, বিপিনবিহারী গোস্বামী, কেদারনাথ দত্ত, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, শিশিরকুমার ঘোষ, প্রিয়নাথ নন্দী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ। এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন কেদারনাথ দত্ত। নদীয়া জেলার উলা বীরনগর গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশনে এবং পরে কিন্তু হিন্দু কলেজে পড়াশোনা করেন। উনিশ শতকের কলকাতায় প্রথম জীবনে তিনি একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কটক স্কুল শিক্ষক হিসেবে তাঁর চাকরিজীবন শুরু হয়। পরে তিনি কিছুকাল বর্ধমান মহারাজের মুনসেফ হিসাবে কাজ করেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডেপুটি রেজিস্টারের চাকুরিতে যুক্ত হন এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উত্তীর্ণ হন। ১৮৬০ এর দশক থেকে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রচুর ভক্তি গ্রন্থ রচনা করেন এবং ভক্তিমূলক পত্রিকা "সজ্জনতোষনী" সম্পাদনা করেন। সজ্জনতোষনী পত্রিকাটি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করত, সমকালীন প্রকাশিত বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থের আলোচনা ও সমালোচনা করত, পাঠকমন্ডলীর প্রেরিত রচনাও প্রকাশ করত। তাছাড়াও বিভিন্ন বৈষ্ণব কাহিনি, বৈষ্ণব মহান্তদের জীবনী এবং সমকালীন বৈষ্ণব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশ করত। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রাচীন গ্রন্থ সংরক্ষণ ও প্রকাশের জন্য ১৮১, মানিকতলা স্ট্রিটে একটি ডিপসিটরি প্রেস তৈরি করেন। ১৮৮০ এর দশকে তিনি বৈষ্ণব রসরাজ সভা নামে তিনি একটি বৈষ্ণব মন্ডলী তৈরি করে করেন। এই সভার দায়িত্বে ছিলেন বিপিনবিহারী গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হরিগোপাল গোস্বামী। এই সভার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে যেতেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে তার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য নদীয়া জেলার বাখনাপাড়ার গোস্বামীরা তাঁকে 'ভক্তিবিনোদ ঠাকুর' উপাধি প্রদান করেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ দেহত্যাগ করেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবদের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা সাধারণ মানুষের সামনে কাছে প্রচার করা। তিনি এই কাজ ইতিবাচকভাবে প্রয়োজনীয় বৈষ্ণববিধি প্রচারের মাধ্যমে এবং নেতিবাচকভাবে বৈষ্ণব বিরুদ্ধ ব্যবহারের সমালোচনার মাধ্যমে

প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। কেদারনাথ বৈষ্ণব গৃহস্থকেই তার সংস্কারমুক্ত বৈষ্ণবধর্মের ধারক ও বাহক হিসাবে পরিকল্পনা করেন। 'মুষ্টি ভিক্ষা' নামক প্রবন্ধে এবং 'জৈব ধর্ম্ম' নামক গ্রন্থে তিনি বৈষ্ণব ভিক্ষুকদের দ্বারা গৃহস্থদের নির্যাতনের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে মুষ্টি ভিক্ষা প্রথাটি যদি একেবারে উঠিয়ে দেওয়া যায় তাহলে দোষ হয় না। যেখানে বৈষ্ণবধর্মে মুষ্টিভিক্ষাদান বৈষ্ণবধর্মে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করা হত সেখানে কেদারনাথের এই মনোভাব গৃহস্থদের প্রতি পক্ষপাতকেই বোঝায়। শুধু তাই নয় এমন কি বাংলার বিবিধ বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়গুলিকে তিনি 'পরগাছা বলে অভিহিত করেন, তাদের সমূলে বিনাশই তার কাম্য ছিল। বৈষ্ণবদের কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত এই বিষয়ে তাঁর 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকায় এই ধরনের বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যেমন- 'সম্প্রদান প্রণালী', 'উপধর্ম', 'বাউলমতের বিচার', 'সহজিয়া মতো হেয়ত্ব', 'গুরুপদাশ্রয়', 'দৈন্য', 'আচার' ইত্যাদি। আসলে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা একটি সংস্কারপূর্ণ ধর্মীয় পরিকাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৯০-এর দশকে কেদারনাথের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল নবদ্বীপের অপর পারে মায়াপুরে শ্রী চৈতন্যের জন্মস্থান আবিষ্কার এবং সেখানে জনসাধারণের অনুদানের সাহায্যে যোগপীঠ মন্দির স্থাপন। কেদারনাথ ছাড়াও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকার সম্পাদক রাধিকানাথ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ঢুকে থাকা বিভিন্ন উপসম্প্রদায়গুলি যেমন - বাউল, দরবেশ, সহজিয়া, কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির বিরোধিতা করেন এবং প্রকৃত গৌড়ীয় ভাবাদর্শকে নাগরিক সমাজে পৌছে দিতে চেষ্টা করেন। বিপিন বিহারী গোস্বামী তার 'দশমূলা রহস্য' গ্রন্থে বিভিন্ন উপসম্প্রদায় গুলির যেমন বিরোধিতা করেন তেমনই বৈষ্ণব আচারের প্রতি বিশেষ জোর দেন।

সংস্কারবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ছাড়াও ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাবে যে ইতিহাস চেতনা তৈরি হয়। এর প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালি বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে একজন ঐতিহাসিক চরিত্র রূপে প্রতিস্থাপন করার উদ্যোগ দেখা যায়। উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকদের ইতিহাস নির্মাণের চহিদার ক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের মতো বৈষ্ণব সাহিত্যগ্রন্থগুলি নতুন শৈলীতে ইতিহাস রচনার রসদ জুগিয়েছিল। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'দ্য লিটারেচর অব কোলে' বইতে শ্রীচৈতন্যকে মার্টিন লুথারের সঙ্গে তুলনা করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Essays Theological and Ethical' বইতে কেশবচন্দ্র সেন চৈতন্যকে Prophet of Nadia বলে উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মেকে ভক্তিধর্মে রূপান্তরিত করেন। নববিভক্ত ব্রাহ্মদের নতুনভাবে উৎসাহিত করতে যে ভক্তিরসের উন্মাদনা দরকার কেশবচন্দ্র তা ভালোই বুঝেছিলেন। ১৮৬৭খ্রিস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর বৈষ্ণব সংকীর্তনের অনুকরণে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ক্ষেত্রে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন কেশব সেনের প্রধান সহায়ক, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজগোপাল গোস্বামী সেইদিন এই সংকীর্তনে

যোগ দিয়েছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ 'প্রেম পরশমনি শ্রীশচীনন্দন' -এর সুরে যেই ব্রহ্মসঙ্গীতটি গাওয়া হয়েছিল, সেটি হল-

"পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়া লুটাইরে
পতিত পাবন পিতা ভকত বৎসল উদ্ধারে জাপি জনে দেখিয়া অসহায় রে..."[৫]

১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারি ভারতবর্ষীন ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে রাস্তায় প্রকাশ্য নগরসংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেইদিন শুধু কেশব-অনুরাগী ভক্তমণ্ডলীরাই এই সংকীর্তনে যোগ দিয়েছিল এমন নয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোকরাও দলবদ্ধভাবে এই কীর্তনে যোগদান করেন। তাই কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মভক্তি ভক্তি আন্দোলন প্রথমদিকে নেড়ানেড়িকান্ত বলে নিন্দিত হলেও পরবর্তীকালে বিপুল জনসমর্থন লাভ করেছিল। এই ব্রাহ্মভক্তি আন্দোলনের দ্বারাই পরবর্তীকালে নবগৌরাঙ্গ আন্দোলন প্রভাবিত হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের মতো রাজেন্দ্রলাল মিত্রও তাঁর অনূদিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের মুখবন্ধে সমকালীন দুই সংস্কারক মার্টিন লুথার ও চৈতন্যদেবের মধ্যে তুলনা করার চেষ্টা করেন। ইংরেজি শিক্ষা এবং ইউরোপীয় নবজাগরণের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কারণেই রিফর্ম, রিফর্মার, প্রফেট এই শব্দগুলি চৈতন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শুরু করেন বিভিন্ন লোকেরা।

এই যুগেই চৈতন্যকে বাঙালি তার সাংস্কৃতিক সত্তা অর্থাৎ ইতিহাস, সাহিত্য ও গণ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসেবে গড়ে তুলতে দেখা যায়। এই প্রতিবেদনের প্রবক্তা ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের জন্ম ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর জন্ম হয়েছিল শাক্ত পরিবারে। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের ইংরেজি বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁর মেজভাই হেমন্তকুমার ঘোষ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তখন শিশিরকুমারও কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেই যোগ দেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রকে নিয়ে ভক্তদের মধ্যে যে অবতারবাদ তৈরি হয়, এতে বিরক্ত হয়ে হেমন্তকুমার এবং শিশিরকুমার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে যে বৈষ্ণবভাব প্রচ্ছন্ন ছিল হেমন্তকুমার তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন এবং যশোহরে ভক্তিধর্ম প্রচার করতে চলে যান। কিন্তু এই সময় শিশিরকুমারের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে ধর্মীয় ব্যাকুলতা তাকে বৈষ্ণবভক্তিধর্মের দিকে টেনে আনল। গৌরাঙ্গলীলা জানার জন্য চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবত পড়তে শুরু করলেন। চৈতন্যভাগবত পাঠ করে তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। শিশিরকুমার ঘোষ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং উনিশ শতকের শেষে বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নবগৌরাঙ্গ আন্দোলনের সূচনা করেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম নিয়ে যে বিরূপ মনোভাব ছিল এতদিনে তা দূর হয়ে গেছে। হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি কৃষ্ণ ও চৈতন্য বিষয়ে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। এইসময়ে বিভিন্ন

পত্রপত্রিকায় চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধও প্রকাশিত হচ্ছে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদর্শনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস 'চৈতন্য' শিরোনামে চৈতন্যজীবনীবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম'। ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্ব, চৈতন্যের সন্ন্যাস, গৌতম ও গৌরাঙ্গ বিভিন্ন প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময় শিশির কুমার নবগৌরাঙ্গ আন্দোলনকে কয়েকটি বিশেষ প্রচারপদ্ধতির মাধ্যমে সুসংগঠিত করে তোলেন। ৪০৫ চৈতন্যাব্দ বা ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা চৈত্র শিশির কুমার ঘোষের পৃষ্ঠপোষকতায় 'শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া 'পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন রাধিকানাথ গোস্বামী ও কেদারনাথ দত্ত। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মের চর্চা ও প্রচার এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। পত্রিকাটি প্রথমে ছিল পাক্ষিক পরে মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। কিছুকাল পরে পত্রিকাটি 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সঙ্গে মিলিত হয়ে 'বিষ্ণুপ্রিয়া আনন্দবাজার' নামে প্রকাশ হতে থাকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৈষ্ণব ধর্মালোচনার চর্চা যে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা এই পত্রিকার প্রথম কয়েক বছরের প্রবন্ধ ও আলোচনার দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা শিশিরকুমারকে নব গৌরাঙ্গ আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করেছিল, উনিশ শতকে বাংলায় ছাপাখানা আসার ফলে প্রচার কাজ অনেক সহজ হয়ে।এই জনসংযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল সাময়িক পত্র, শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা এই সময় ব্রাহ্ম ও খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাব হ্রাস করে শিক্ষিত বাঙালিদের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে। ৪১৬ গৌরাঙ্গব্দে অর্থাৎ ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে শিশির কুমার প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ সমাজের মুখপত্র শ্রীশ্রী গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে শিশির কুমার ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে গৌরাঙ্গ সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। টাকীর জমিদার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এই সমাজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং সম্পাদক ছিলেন ডাক্তার রসিক মোহন চক্রবর্তী বিদ্যাভূষণ। এই সমাজের সাধারণ অধিবেশনে বৈষ্ণবশাস্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা বক্তৃতা ও নামসংকীর্ত্তন হত। এছাড়া গৌরাঙ্গ সমাজের পক্ষ থেকে কলকাতা শহরে বিজ্ঞাপন দিয়ে চৈতন্যের জন্মোৎসব পালন করা হয়।

শিশির ঘোষ তার 'Lord Gouranga or Salvation for all' বইতে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও দেবত্বের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার মাধ্যমে গৌরাঙ্গকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি যীশু ও মহম্মদের মত চৈতন্যের অবতারত্বের ধারণাকে সমর্থন করেন। পরবর্তীকালে 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে বাঙালির জাতীয় প্রভু রূপে চৈতন্যকে দাবি করেন। আসলে শিশির ঘোষ শ্রী চৈতন্যকে কেন্দ্র করে বাংলায় জাতীয় সংস্কৃতি গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। পরিশেষে বলা যায়, উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বৈষ্ণবরা যেমন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব ঐতিহ্যকে শিক্ষিত শ্রেণির কাছে গ্রহণযোগ্য করে আধুনিক রূপে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। আবার বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে বিরোধিতা চালিয়ে যান। তার পাশাপাশি ধর্ম ভিত্তিক বাঙালি জাতি গঠনের ধারাটিকেও এই প্রক্রিয়া পুষ্ট করেছিল।

তথ্যসূত্র

১. Tridandi Bhakti Pragyana Tirtha Maharaj. *Renaissance of the Gaudiya Movement.* Sri Gaudiya Math, 1980, p.46.

২. Ward, William. *A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos: Including a Minute Description of Their Manners and Customs and Translation of Their Principal Works.* 2nd ed., Mission Press, 1815, p.175.

৩. Ward, William. *A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos: Including a Minute Description of Their Manners and Customs and Translation of Their Principal Works.* 2nd ed., Mission Press, 1815, p.225.

৪. Bhattacharya, Jogendranath. *Hindu Castes and Sects: An Exposition of the Origin of the Hindu Caste System and the Bearing of the Sects Towards Each Other and Towards Other Religious Systems. Thacker, Spink & Co.*, 1896, p.366.

৫. রায়, গৌরগোবিন্দ। *আচার্য কেশবচন্দ্র সেন.* প্রথম খণ্ড, নববিধান প্রেস, ১৯৩৮, পৃ. ৪০১।